Phoenix: International Multidisciplinary Research Journal
Vol 1, No. 1, Jan-March 2020
ISSN: 2583-6897
Special Issue

লোকসংস্কৃতি এবং দেবেশ রায়ের তিনটি উপন্যাস

ড. মহুয়া চট্টোপাধ্যায়
সহকারী অধ্যাপক
লোকনায়ক অমিয় কুমার দাস মহাবিদ্যালয়, ঢেকিয়াজুলি

সংস্কৃতি শব্দটির মধ্যে মানুষের 'কৃতি' বা সৃষ্টির প্রয়াসের ইঙ্গিত রয়েছে। গোপাল হালদার তাঁর *সংস্কৃতির বিশ্বরূপ* গ্রন্থে বলেছেন যে মানুষের সভ্যতা বা সংস্কৃতির মূল প্রেরণা তাই প্রকৃতির অন্ধ দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়া,অর্থাৎ জীবিকা আয়ত্ত করা, তা সহজসাধ্য করা। সেজন্যই মানুষ অন্য জীব অপেক্ষা উন্নত হয়েছে এবং স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে।[১] জাতি, ধর্ম, দেশ, গোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য সংস্কৃতির মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। লোকসংস্কৃতি হল এক বিশেষ ভৌগোলিক সামাজিক পরিবেশে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর সামগ্রীক জীবনের পরিচয়। গ্রামবাংলার লৌকিক সংস্কৃতি এবং নগরকেন্দ্রিক অভিজাত সংস্কৃতি --এই দুই হল লোকসংস্কৃতির দুটি বহমান ধারা। কৃষির উদ্ভবের পর থেকেই মানবগোষ্ঠী স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেছে আর তখন থেকেই লোকসংস্কৃতির সূত্রপাত হয়েছে। বলা যেতে পারে কৃষির সঙ্গে লোকসংস্কৃতির যোগ প্রথমাবধি। একথা ঠিক বাংলার কৃষকজীবনের সামগ্রীক পরিচয় পুরোপুরি জানতে হলে তাদের সংস্কৃতিকে জানতেই হবে। অবিভক্ত বাংলার বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলেযে কৃষকেরা বাস করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এক। তাদের শিক্ষা , স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা নেই, আছে শুধু বংশ পরম্পরায় শোষণের উত্তরাধিকার। বাংলার এই নিরীহ, সহজ, সরল চাষিদের জীবনের মানদণ্ড এক হলেও তাদের লোকায়ত সংস্কৃতি কিন্তু বৈচিত্র্যপূর্ণ ও অঞ্চলভেদে আলাদা। বীরভূম-বাঁকুড়া-উত্তরবঙ্গ-মেদিনীপুর- যশোহর- ময়মনসিংহ ইত্যাদি অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং আকর্ষণীয়। কৃষকজীবন, তাদের সংস্কৃতি অসংখ্য বাংলা উপন্যাসের পটভূমি রচনা করেছে।

বাংলা উপন্যাসে দেশজ আঙ্গিককে পুর্নগঠিত করে, ভাষায় এবং বাক্যবিন্যাসে নতুনত্বের ছোঁয়া এনে, উপন্যাসে মহাকাব্যিক আবহ গড়ে তুলে যিনি বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাসে ভাস্বর হয়েছেন তিনি দেবেশ রায়। তাঁর বেড়ে ওঠা উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়িতে। আবাল্য রাজনীতির আবহাওয়ায় বড়ো হয়েছেন তিনি। ছাত্র অবস্থাতেই বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত দেবেশকে পার্টির কাজে উত্তরবঙ্গের তিস্তা নদী-সংলগ্ন এলাকায় থাকতে হয়েছে। সেই সূত্রেই সেখানকার কৃষকসমাজকে কাছে থেকে জানার সুযোগ হয় তাঁর। তৎকালীন বাম আন্দোলন ছিল মূলত কৃষক স্বার্থকেন্দ্রিক। দেবেশ রায় তাই সেই সময়কার কৃষকদের সমস্যা, আন্দোলন, সরকারের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন। সেই অভিজ্ঞতারই ফসলই তাঁর তিনটি উপন্যাস--*মফস্বলী বৃত্তান্ত*, *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* এবং *তিস্তাপুরাণ*। তিনি তাঁর প্রত্যেকটি উপন্যাসেই ইতিহাস, ভূগোলের পাশাপাশি কৃষকজীবনের সংস্কৃতিকে তুলে ধরেছেন। এই তিনটি উপন্যাসে কৃষিসংস্কৃতি কীভাবে ফুটে উঠেছে তা দেখে নিই।

দেবেশ রায়ের *মফস্বলী বৃত্তান্ত* গ্রামীণ নিম্নবর্গীয় কৃষক-সমাজের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। উত্তরবঙ্গের তিস্তা নদী সংলগ্ন গৌরিহাট, গোলান্দিপাড়া, সাতখামার, হাটখোলা, বরমডাঙা, দ্বারিকামারি, গাঠিয়াপাড়া ইত্যাদি অঞ্চলে বসবাসকারী রাজবংশী কৃষকদের জীবন ও সেইসঙ্গে আশির দশকের গোড়ার দিকের পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক চালচিত্র উপন্যাসটিতে ফুটে উঠেছে। উপন্যাসের মূল চরিত্র খেতখেতু। খেতখেতুর পরিবারের তিনদিনের বাসি খিদে এবং আগামী অনিশ্চিত খিদের অন্তরালে নিহিত হয়ে আছে জমি-সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন-কানুনের মারপ্যাঁচ। খেতখেতুরা আইন-কানুন বোঝে না, তারা জানে শুধু জমি, ফসল আর চাষাবাদের খুঁটিনাটি। *মফস্বলী বৃত্তান্ত*-এর মতো একই প্রান্তিক রাজবংশী কৃষকদের জীবন ফুটে উঠেছে দেবেশ রায়ের *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* উপন্যাসেও। তিস্তা নদীকে সুবৃহৎ পটভূমিকায় রেখে আপলচাঁদ ফরেস্ট ছাড়িয়ে যে এলাকা তা-ই এই উপন্যাসের প্রেক্ষণবিন্দু। 'অক্ষরজ্ঞানহীন' এই বৃত্তান্ত জুড়ে রয়েছে বাঘারু, কাদাখোয়া, মাদারি, মাদারির মায়ের মতো সমাজের একেবারে নিম্নবর্গীয় শ্রেণি যাদের রাজনীতি, উন্নয়ন, মিছিল মিটিং স্পর্শ করে না। *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* লেখার কুড়ি বছর পর দেবেশ লেখেন *তিস্তাপুরাণ* উপন্যাস। একই ভূখণ্ড, জলহাওয়া, একই রাজবংশী জীবন-সংস্কৃতি এই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। শেষ থেকে শুরু এই উপন্যাসে বুড়িমা ও তার গোতের জীবনচর্যা বর্ণিত হয়েছে। ডুয়ার্স অঞ্চলের এবং তিস্তার চর অঞ্চলের কৃষক জীবনের সূত্রে এসেছে তাদের কৃষিসংস্কৃতির খুঁটিনাটি।

লোকসংস্কৃতির একটি প্রধান অঙ্গ লোকবিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান এবং উৎসবকেন্দ্রিক সংস্কৃতি। লোকবিশ্বাসের সঙ্গে ঐতিহ্যের সম্পর্ক নেই বললেই চলে তবে লোকসংস্কারের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। এর মূলে রয়েছে ঐহিক শুভাশুভ সম্পর্কিত ধারণা। *মফস্বলী বৃত্তান্ত*-এ সকালে সূর্য ওঠার আগে উঠোন গোবর দিয়ে লেপার প্রসঙ্গ রয়েছে। সারাদিন ধরে যে উঠোনে ধান কোটা, সিদ্ধ করা হয় তাকে শুদ্ধ করতেই হয়। তারা বিশ্বাস করে ঘর অশুদ্ধ হলে যেমন ধান নষ্ট হয়ে যায় তেমনই দেহ অশুদ্ধ থাকলেও ধান নষ্ট হয়ে যায়--"ঘর অশুদ্ধ থাকিলে ধান জাই হয়া যাবে।...কুনো অঙ্গ অশুদ্ধ রাখিলে ধান জাই হয়া যাবে।"[২] এই উপন্যাসেই এক জাদু বিশ্বাসের উল্লেখ পাই। শেষ রাতে কার্তিক মাসের পাকাধান ভর্তি মাঠে পরীরা নেমে আসে বলে রাজবংশী কৃষকরা বিশ্বাস করে। সকালে ধানখেতে গেলে দেখা যায় পরীর পায়ের দোলায় মাটিতে ধান ঝরে পরেছে। ভালো করে লক্ষ করলে পরীর পায়ের ছাপও যেন দেখতে পাওয়া যায়। সেজন্য শেষ রাতে কখনো জমিতে যেতে নেই।[৩] *তিস্তাপুরাণ*-এ রয়েছে রাজবংশী কৃষক বিশ্বাস করে ধানখেতের আলে বসে চিড়ে-মুড়ি খেতে নেই।[৪] এতে ভূমাতা ক্ষুব্ধ হন। ফলে ফসল উৎপাদন কমে যায়। তারা এও বিশ্বাস করে যে ধান পা দিয়ে নিরোতে হয় যদিও কিন্তু আতপ ধান পা দিয়ে নিরোতে নেই।[৫] বৃষ্টি সম্পর্কিত এক বিশ্বাসের পরিচয় রয়েছে *তিস্তাপুরাণ*-এ। উপন্যাসে দেখি ছোটোদাদা বৃষ্টি দেখেও মাথায় 'মাথোয়াল'(টুপি) দেয়নি কারণ তারা বিশ্বাস করে " আগুরি বৃষ্টিতে অত মাথোয়াল-টাথোয়াল চাপালে মেঘ দেশান্তরে যায়।"[৬]রাজবংশী কৃষকেরা এও বিশ্বাস করে, যে জিনিস তারা কোনোদিন খায়নি তা খেতে নেই, যে জিনিস নিজেরা কোনোদিন চাষ করেনি, তা নিজেরা খাবে না, কাউকে খেতেও দেবে না। *তিস্তাপুরাণ* উপন্যাসে কৃষি-সংক্রান্ত একটি সংস্কারের উল্লেখ রয়েছে। কৃষি জমিতে কাকতাড়ুয়া তৈরি বাংলার কৃষকদের অতি প্রাচীন সংস্কার। তামাক খেতে অসুস্থ ঢ্যামনা নিজেকে খেতের নজরকাঁটা কাকতাড়ুয়া মনে করেছে।[৭]

বাংলার কৃষকেরা কৃষি ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাস-সংস্কারের বশবর্তী হয়ে জীবন কাটায়। তেমনই এক সংস্কার 'বাণ মারা'। ভুঁইচালীর জন্মের আগে তার মাকে বাণ মারা হয়েছিল বলেই সে বাঁচেনি বলে সকলে বিশ্বাস করেছে 'তিস্তাপুরাণ'-এ। *মফস্বলী বৃত্তান্ত*-এ যখ-এর প্রসঙ্গ রয়েছে। উপন্যাসে অভুক্ত বেঙ্গু ভাতের আশায় মরতেও রাজি হয়ে যায়--"দাদা হামার বড়ো ভোক। হামাক মারি ফেলা। মুই আর বেঙ্গু থাকিম না। মুই যখ হম।[৮]

লোকাচার

বিশ্বের সকল দেশের, সকল সমাজেই বিভিন্ন পালা-পার্বণ সমৃদ্ধ লোকাচার রয়েছে। লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান সাধারণত কোনো দেবদেবী, অপদেবতা প্রভৃতিকে তুষ্ট করতে, কিংবা প্রাকৃতিক বা অপ্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতে অথবা কোনো শুভ কামনায়, অশুভ শক্তিকে বিতাড়িত করতে করা হয়ে থাকে। এতে মহিলারাই মুখ্য ভূমিকা নিয়ে থাকে। যেকোনো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে 'গোবর-লেপন' একটি লোকাচার। শুধু পুজো-পার্বণে নয়, *তিস্তাপুরাণে* আছে ঢ্যামনার মৃত্যুর পর তার মৃতদেহকে উঠোনে শায়িত করার পূর্বে উঠোন গোবর দিয়ে লেপা হয়েছে।[৯] প্রকৃতপক্ষে এই লোকাচারের উৎস গ্রাম্য সংস্কার।

পার্বণ-উৎসব-অনুষ্ঠান

বিভিন্ন ধরনের পালা-পার্বণ-উৎসব ইত্যাদি গোষ্ঠীজীবনের প্রাণময়তাকে প্রকাশ করে। যেকোনো উৎসবের মূল কথা মিলন। মিলনের মধ্যেই উৎসবের সৃষ্টি ও তৃপ্তি। লোকজীবনে উৎসব এক নতুন জীবন-ছন্দ বয়ে আনে। দৈনন্দিন অভাব, দুঃখ-দারিদ্র্যকে লঘু করে, প্রাত্যহিক জীবনের গ্লানি, কালিমাকে অস্বীকার করে, উৎসবে মেতে ওঠে সকলে। গ্রাম-বাংলার কৃষক জীবনকে বুঝতে তাই তাদের উৎসব-উনুষ্ঠান, পুজো-পার্বণ এবং মেলার পরিচয় জানা আবশ্যক। উৎসব দু-ধরনের হয়ে থাকে--পরিবারকেন্দ্রিক ও সামাজিক। পারিবারিক উৎসবে নারীর ভূমিকা মূখ্য। উত্তরবঙ্গের একটি অন্যতম কৃষি-পার্বণ হল গরুচুমানি। এই গরুচুমানির বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে *তিস্তাপুরাণ*-এ। কার্তিক সংক্রান্তির দিন এই উৎসব পালিত হয়। গরুকে স্নান করিয়ে তার কপালে, শিঙে, ক্ষুরে তেল-সিঁদুর, হলুদবাটা, ধান-দূর্বা, পান এবং গুয়া ছোঁয়ানো হয়। এই দিন রাখোয়াল চুমানিও হয়ে থাকে। কৃষক বনিতারা তাদের স্বামীকে রাখাল হিসেবে তেল-সিঁদুর মাখায় ও গান গায়। এর পর হয় বাখর খাওয়ানো। পাকা লাউ, পেঁয়াজ, মশলাপাতি, নতুন কাটা ঘাস, জলে এর নুনে মিশিয়ে বাখর তৈরি করে গরুকে নতুন চারিতে খেতে দেওয়া হয়।[১০] উত্তরবঙ্গের রাজবংশী কৃষক-সমাজের একটি উৎসব তিস্তাবুড়ি পূজা। *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* উপন্যাসে এই পূজার বর্ণনা রয়েছে। উপন্যাসের এক চরিত্র সুস্থির তিস্তা ব্যারেজের বিরুদ্ধতার প্রসঙ্গে জল্পেশ্বর মন্দিরে তিস্তাবুড়ি পুজোর কথা বলেছে।[১১] *তিস্তাপুরাণ*-এও এই পুজো উপলক্ষে মেছেনি খেলার প্রসঙ্গ রয়েছে।[১২] আসলে রাজবংশী সম্প্রদায় তিস্তা নদীকে দেবতা হিসেবে পুজো করে থাকে। তিস্তার ভয়ংকর রূপের কথা চিন্তা করেই এই পুজো করা হয় যাতে তিস্তাবুড়ি সকলকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেন।

লৌকিক দেবতা

সাধারণত লৌকিক দেবতার মধ্যে যাঁরা নারী তাঁদের আরাধনার মূলে থাকে কোনো না কোনো কামনা। গ্রমীণ সমাজে রোগ-মহামারির প্রাদুর্ভাব বন্য পশু , সাপের কামড় ইত্যাদি থেকে রক্ষা পাবার জন্য অনেক দেব-দেবীর আরাধনা করা হয়। এছাড়া অধিক ফসলের কামনা, খরা-অনাবৃষ্টি সময় বর্ষার কামনা, উর্বরতা-সম্পদ বৃদ্ধির কামনা এবং বিপর্যয় থেকে গ্রামকে রক্ষা করার কামনা থেকেও লৌকিক দেব-দেবীর পুজো করা হয়ে থাকে। যেমন তিস্তাবুড়ির পুজো। 'তিস-তা' শব্দটি জলবাচক। জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কোচবিহার অঞ্চলে জল কামনায় এই দেবীর পুজো করা হয়। *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*এবং *তিস্তাপুরাণ* উপন্যাসে তিস্তাবুড়ির পুজো ও গানার উল্লেখ রয়েছে। মাসান এক ভয়ংকর দেবতা। রোগাক্রান্ত এ বিকারগ্রস্ত মানুষের আরোগ্য কামনায় এই পুজো করা হয়। *মফস্বলী বৃত্তান্ত* ও *তিস্তাপুরাণ*-এ মাসানের উল্লেখ আছে। এই মাসানের আবার বিভিন্ন প্রকারভেদ থাকে। *মফস্বলী বৃত্তান্তে* ভুলামাসান ও *তিস্তাপুরাণে* জলুয়া মাসানের প্রসঙ্গ রয়েছে।

ব্রত

আকাঙ্ক্ষা পূরণের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত আচার বিধি পালন করা হয় তা-ই ব্রতের মূল কথা। ব্রতের প্রধান বাহক নারী তবে পুরুষের পালনযোগ্য দু-একটি ব্রতও আছে। কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনীতিতে যে ধর্মাচার রয়েছে সেখানে শস্য ও উর্বরতাসূচক প্রতীকগুলিকে শুভচিহ্ন হিসেবে গণ্য করা হয় এবং ব্রতের আচারে সেগুলোকে ব্যবহার করা হয়। *তিস্তাপুরাণ*-এ যে তিস্তাবুড়ি পুজোর কথা আছে সেখানে মেছেনি খেলার প্রসঙ্গ রয়েছে। এই মেছেনি খেলা আসলে কোনো খেলা নয়, এটি রাজবংশী নারীদের পালিত একটি ব্রত। বৈশাখ মাসের প্রথম দিন থেকেই এই অনুষ্ঠান শুরু হয়। কৃষকের স্ত্রীরা প্রতি বাড়িতে গিয়ে নৃত্য-গীতের মাধ্যমে মাগন সংগ্রহ করে। শেষে সেই মাগন দিয়ে পুজো হয়।

শিকার

শিকারের উল্লেখ পাই *তিস্তাপুরাণ*-এ। গরুচুমানির দিন শিকারে বেরনো যে নিয়মের মধ্যে পড়ে তার উল্লেখ পাচ্ছি। উল্লেখ্য যে উপন্যাসে 'শিকার' নামাঙ্কিত একটি পরিচ্ছেদই রয়েছে। ছোটোদাদা এ অন্যান্য কৃষকদের একসাথে শিকারের বর্ণনা দিয়েছেন লেখক।[১৩]

ছড়া

লোকসাহিত্যের এক বিশেষ শাখা হল ছড়া। ছড়া মুখে মুখে রচিত অন্ত্যমিলযুক্ত ছোটো আকারের পদ্য। এগুলি সাধারণত দুই, চার, ছয়, আট চরণে নির্মিত। ছড়ার বেশ কয়েকটি ভাগ রয়েছে যেমন ছেলেভুলানো ছড়া, যাদুমূলক ছড়া, ব্রতের ছড়া, পরিহাসমূলক ছড়া, শ্রম-বিষয়ক ছড়া ইত্যাদি। *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* উপন্যাসে বেশ কিছু ছড়ার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ছড়াগুলি রাজবংশী জনজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

পয়লা হাটত দোকানিয়া বেচে
মাঝা হাটত দেউলিয়া বেচে
শেষো হাটত ঘরুয়া বেচে।(পৃ. ১৪)

গ্রাম্য হাটের কেনা-বেচা সংক্রান্ত জ্ঞানের পরিচয় বহন করছে ছড়াটি। একটি পরিহাসমূলক ছড়াও রয়েছে উপন্যাসে--

ঠিকাদার আর ইঞ্জিনিয়ার
দ্যাশখান কইরল ছারখার।(পৃ.১৮৪)

এই ছড়াটির মধ্যে কৃষক জীবনের সর্বনাশের মূল দুই শত্রু ঠিকাদার আর ইঞ্জিনিয়ারদের ব্যঙ্গ করা হয়েছে। *তিস্তাপুরাণ* উপন্যাসে পাচ্ছি খেলার ছড়া।

'পৈতন'-খেলার ছড়া--

নোকটুরে নটুয়া
বলদখানের খোটুয়া
বলদের প্যাটের তলত
চৌদ্দ বাতি জ্বলত
জল্লুক ভ্যাণ্ডার ত্যাল
তিতলি খ্যাল।...(পৃ.৭৫)

বৃষ্টি-সম্পর্কিত ছড়া--

সেই আসানই আসিল মেঘ, অ্যালায়
ব্যাঙ পাম কোটত? (পৃ.১৮৮)

রাজবংশী-সমাজে খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কিত ছড়া--

সকালের খোয়া খোকসা-ভাত
দুপহরের খোয়া মুড়ি
বিকালের খোয়া চা আর চুড়া
সনঝার খোয়া ভারী। (পৃ.১৯১)

তিস্তাপুরাণ-এ বুড়িমার গোত তৈরি হওয়া নিয়ে বেশ কিছু ছড়া রয়েছে--

ক) যাক কহিছেন পরের বেটা
উমরা মোর জাতের খোঁটা।
খ) এই বেটাখান মোর, ঐ বেটাখান তোর
সব বেটারই একোখান পেটের ভিতর ঘর।
গ) সন্তান না গুনেন সাধু, সন্তান না গুনেন
গুনিবারই চাহেন যদি আমাসুর তারা গুনেন।
ঘ) মোর কপালের গুনে মই হছি বেটিছোয়া।
না হইলে কোটত পাইতাম আনং ছোয়া-পোয়া। (পৃ.১৭৭)

প্রবাদ

লোকসংস্কৃতির অতি প্রাচীন অংশ প্রবাদ। প্রবাদ সম্পর্কে একটি স্পেনিয় সংজ্ঞায় বলা হয়েছে "A proverb is a short sentence based on long experience"[১৪] অর্থাৎ দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফসল এই প্রবাদ। মানবজীবনের উপর ভিত্তি করেই প্রবাদ গড়ে ওঠে। নানা বিষয়ের মতো কৃষিকে কেন্দ্র করেও রচিত হয়েছে নানা প্রবাদ। কৃষির সঙ্গে জড়িত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রবাদ--

ক) গরু বেচিতে রাখোয়াল ফক্কা। (*তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*, পৃ. ১৪)
খ) কুত্তা আর গাই যা কওয়াবেন তাই।(,, পৃ.২৩৩)
গ) দিনের আলোয় বিলাই কানা, জমির আইলে হালুয়া কানা। (*তিস্তাপুরাণ*, পৃ. ৩৩০)

অন্যান্য প্রবাদ--

ক) খাউয়াইয়ার ভাঁড়ার একটুখানি
না খাউয়াইয়ার ভাঁড়ার মাঠকুরানি। (*মফস্বলী বৃত্তান্ত*, পৃ. ৫৪)
খ) একেবার বাঘ দেখিলে বিলাই দেখিলেও চমক খায়। (*তিস্তাপুরাণ*, পৃ. ৫০০)
গ) ঘরের শোভা হাঁড়িকুড়ি
ছোয়াছোট নাউদারী। (,, পৃ. ২৪৫)
ঘ) জাই গেল ক্ষেতবাড়ি মধ্যে হইল পথ
জাই গেলেন গিরির বৌ নিত্য যাছে হাটত। (,, পৃ.২২৯)

ডাক ও খনার বচন

বাংলার কৃষিজীবী মানুষেরা ডাক ও খনার বচন মনে-প্রণে বিশ্বাস করে। খনার বচনে গার্বস্থ জীবন, পশুপালন, চাষাবাদের নিয়মকানুন বর্ণিত হয়েছে। ফসল কাটা সম্পর্কিত বচন পাই *মফস্বলী বৃত্তান্ত*-এ।

ক) শিষ দেখলে বিশ দিন কাটে মারে দশ দিন।(পৃ.৩১)
খ) অঘনে পেটি, পুষে চেউটি
মাঘে নারা, ফাগুনে কাড়া। (পৃ. ৬৮)

গৃহ-নির্মাণ সম্পর্কিত একটি বচনের উল্লেখও রয়েছে *মফস্বলী বৃত্তান্ত*-এ।

পূবে হাঁস, পচ্চিমে বাঁশ, দক্ষিণে ধুয়া, উত্তরে গুয়া। (পৃ.৯১)

ধাঁধা

ধাঁধা লোকসাহিত্যের অপরিহার্য অঙ্গ। বিশিষ্ট গবেষক বরুণ কুমার চক্রবর্তী তাঁর *ধাঁধা : স্বরূপসন্ধান* গ্রন্থে বলেছেন "ধাঁধা আসলে নিজের অভিজ্ঞতাকে বিচিত্রভাবে প্রকাশ করার একটি বিশেষ আঙ্গিক।"[১৫] সাধারণত প্রশ্নের আকারে ধাঁধা রচিত হয়। ধাঁধা একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্র্য সঞ্চার করে। *তিস্তাপুরাণ* উপন্যাসে আমরা একটি ধাঁধার উল্লেখ পাই--

ক) প্রশ্ন-হিতি গেনু, উতি গেনু, গেনু মরাঘাট
অ্যাকো গাছ দেখিবার ধইচছু ফলের উপর পাত।

উত্তর- কাঁটা-কনঠাল (পৃ. ৭৮)

উল্লেখযোগ্য যে উত্তরবঙ্গে ধাঁধাকে বলা হয় 'দস্তান', 'ছিল্কা', 'ছিকা-ছটকি', 'শিল্লক', 'শোলক' ইত্যাদি।[১৬] কিন্তু *তিস্তাপুরাণ*-এ একে 'ফাকিলি' বলা হয়েছে।[১৭]

লোকসংগীত

বাংলার লোকসংস্কৃতির সবচাইতে সমৃদ্ধ ও প্রাণময় অঙ্গ হল লোকসংগীত। বাংলার অসংখ্য উপভাষায় যে নিজস্ব শব্দভাণ্ডার, উচ্চারণরীতি ও আঞ্চলিকতা রয়েছে তাই লোকসংগীতের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। বিশিষ্ট গবেষক ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর *বাংলা লোকসংগীত রত্নাকর* গ্রন্থে বলেছেন "বাংলাদেশকে জানিতে হইলে গানের মধ্য দিয়া ইহাকে জানা যত সহজ অন্য কোন বিষয়ের মধ্য দিয়াই তাহা তত সহজ নয়।"[১৮] আলোচিত উপন্যাসগুলোতে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের লোকগানের পরিচয় ফুটে উঠেছে।

ভাওয়াইয়া গানের ব্যবহার রয়েছে *তিস্তাপুরাণ* এবং *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*-উপন্যাসে। বাঘারু মইষাল বন্ধুকে নিয়ে গান গেয়েছে--

বাথান বাথান করিসেন মাইষাল রে-এ-এ
(অ-তোর) বাথান করিলেন ঘর।...
অ মোর মইষাল বন্ধু রে এ এ-(*তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* পৃ.২৬৮)

গানটিতে বাঘারু যেন নিজেই মইষাল, নিজেই তার বিরহিনী নায়িকা হয়ে উঠেছে। এই উপন্যাসেই আরেকটি গান পাই যে গান মায়েরা সন্তানকে স্নান করানোর সময় গায়-

উঠেন উঠেন বেলাঠাকুর চিকচিক্যানি দিয়া
উঠেন উঠেন বেলাঠাকুর আগুন টকটক হয়্যা।(পৃ.২০৩)

'হস্তির কন্যা' এবং 'মাহুত বন্ধু'কে নিয়ে রচিত গান উত্তরবঙ্গ ও নিম্ন অসমে প্রচলিত। সেরকমই একটি বিখ্যাত গানের ব্যবহার রয়েছে *তিস্তাপুরাণ*-এ। তিস্তার চরে কানজি হাতির ডুবে যাওয়ার সূত্রে গানটি গাওয়া হয়েছে।

ও মোর দাঁতাল হাতির মাহুত রে
যেদিন মাহুত শিকার যায়, নারীর মন ঝুরিয়া রয় রে।
ও কি ও মোর সারিন হাতির মাহুত রে
যেদিন মাহুত উজান যায় নারীর মন পুড়িয়া রয় রে।...(পৃ.৬৪৯)

দেবেশ রায় লিখেছেন কোনো বাড়ির নারীদের যখন তাদের প্রেমিকের কথা মনে পড়ে যায় তখনই তারা এই বিরহের গান গায়। তিনি লিখেছেন- "একমাত্র নারীরই থাকতে পারে যে বিরহ, একমাত্র নারীই বলতে পারে যে-বিরহের কথা। ... হাতি যেন তার প্রতিপক্ষ যার টানে মাহুত ঘর ছেড়েছে। হাতী যেন তার আত্মপক্ষ, যার টানে মাহুত ঘরে আসে।"[১৯]

ভাওয়াইয়া গানের চটুল রূপ হল চটকা গান। সেরকমই একটি গান আছে *তিস্তাপুরাণ*-এ। হাটে যাওয়ার সময় রঙিন ফোতা পরিহিতা গ্রাম্য বধূ মুক্তির আনন্দে দেওরকে উদ্দেশ্য করে গান গায়--

ক) চ্যাংড়াবান্ধার হাটতে ঘুনি ফোতা বেড়াইছে
ঘুনি ফোতার বড়ই সুনাম।
কোটত গেইলেন ভাবের দেওরা, মোক কচু খুঁড়ি দেন।...(পৃ.২৩০)
খ) মুই না শোনং না শোনং, তোর বৈদেশিয়া কথা রে। (পৃ.২১১)

নদীকে উদ্দেশ্য করে ভাবের গান গেয়েছে ঘাটোয়ালের বাবা এই উপন্যাসেই-

ও পরান সাধু রে
বড় নদীর তালাশ করিবেন না।...(পৃ.৯৯)

বিবাহ সংগীতও লোকসংস্কৃতির এক বিশেষ দিক। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে মানবিক সেতুবন্ধনের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে বিয়ের গান। *তিস্তাপুরাণ*-এ এরকম একটি গান রয়েছে যা বিয়ের সংয় গাওয়া হয়-

হাটের মধ্যে বাউড়িয়ার হাট, ভোটের মধ্যে পাসি
সেই মতন দেঁখু দাদা, চেংড়ি মাইয়ার হাসি।(পৃ.২৩০-২৩১)

গানটিতে তরুণী বধূর বিভিন্ন গুণাবলীর বর্ণনা করা হয়েছে।

লোকনাট্য

লোকনাট্যের মূল উদ্দেশ্য যদিও নাট্যরস পরিবেশন ও দর্শকের মনোরঞ্জন কিন্তু তা ছাড়াও লোকনাট্যের একটি বড়ো লক্ষ

হল লোকশিক্ষা দান। কখনো লোকনাট্যের মাধ্যমে ন্যায়-নীতি শিক্ষাও দেওয়া হয়ে থাকে। *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* উপন্যাসে আমরা যাত্রা পালার বর্ণনা পাই।(পৃ.৬৬০)

লোকনৃত্য

লোকনৃত্যও তার বৈচিত্র্যসম্ভার নিয়ে লোকসংস্কৃতিকে পুষ্ট করে থাকে। *তিস্তাপুরাণ*-এ তিস্তাবুড়ি পুজো উপলক্ষে যে মেছেনি খেলা হয়ে থাকে তা আসলে নৃত্য-গীতমূলক অনুষ্ঠান।(পৃ.৬৮)

লোকদ্রব্য

ঘর-ব্যবহার্য্য জিনিসপত্র--

মফস্বলী বৃত্তান্ত--এলুমিনিয়ামের গ্লাস, চুবড়ি, ঝুড়ি, দড়ি ইত্যাদি।

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত--থলি, 'কলার ডোঙা ভাজ করে বানানো পাত্র', কুপি, লণ্ঠন,লাউয়ের খোলের পাত্র টোকরাই ইত্যাদি।

তিস্তাপুরাণ--কড়াই, সরা, বস্তা, পিঁড়ি, মাইথাল, ডোল, ঘটি, কলসি, জলের টিন, পাউলিয়া, বিভিন্ন রকমের ঝাঁটা যেমন খররা, বাঁশের বারুণ, শলা ঝাঁটা, বিভিন্ন রকমের হাঁড়ি যেমন চুকাই, ঢেক, ঘারা, পোইলা , ঢেকসা ইত্যাদি।

কৃষিকার্যে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি--

আমাদের আলোচিত তিনটি উপন্যাসেই কিছু যন্ত্রপাতির ব্যবহার রয়েছে যা কৃষিকার্যে ব্যবহার করা হয় যেমন লাঙল, হাল, কাস্তে, কোদাল, ফাল, দড়ি ইত্যাদি। এছাড়া অঞ্চল বিশেষে কিছু নতুন বস্তুর ব্যবহার দেখা যায়। সেগুলি হল--*তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* উপন্যাসে বিভিন্ন ধরনের হালের ব্যবহার--স্যাঁওহাল এবং বাওহাল। *তিস্তাপুরাণ*-এ আছে কাঁচিদাও, বাংকুয়া এবং মাইথালের ব্যবহার। *মফস্বলী বৃত্তান্তে* গরুর মুখ বাঁধার জন্য টোপার ব্যবহার লক্ষিত হয়েছে।

এছাড়াও কিছু লোক অস্ত্রের উল্লেখ পাচ্ছি উপন্যাস তিনটিতে। *তিস্তাপারের বৃত্তান্তে* তীর-কাঁড়, ছুরি, হাতুড়ি এবং *তিস্তাপুরাণে* খন্তা, লাঠি, কুড়ুল এবং বিভিন্ন ধরনের লাঠি যেমন বাঘ তাড়ানোর লাঠি, পাটাঝাড়া লাঠি, পোয়ালের পুঁজি সাজানোর লাঠি, হাতি তাড়ানোর লাঠি, বন্যা দেখতে যাওয়ার লাঠির ব্যবহার দেখা যায়।

লোকযানবাহন

মহিষের পিঠে, ঘোড়ার পিঠে যাতায়াত ছাড়াও সোলোংগার ব্যবহার রয়েছে *তিস্তাপুরাণ* উপন্যাসে।

লোকবাদ্য

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত--শাঁখ, মাদল, বাঁশি ইত্যাদি।

তিস্তাপুরাণ-সাঁড়াশি, ঢোল, কাঁসি ইত্যাদি।

লোকঅলংকার

তিস্তাপুরাণ-এ নোলক, মাকড়ি, চোরা-খারু, সিঁদুর-টিপ এর ব্যবহার দেখতে পাই।

লোকখাদ্য

তিস্তাপুরাণ-এ চিড়ে, মুড়ি, খোকসা ভাত, জল-ভাত, আলু-ছেঁকা, নারকেল গুড় ইত্যাদির উল্লেখ পাই।

লোকচিকিৎসা

লোক-ওষুধ এবং চিকিৎসা পদ্ধতি শুধুমাত্র ভেষজ ওষুধ প্রয়োগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জাদুবিদ্যা, অতিলৌকিক বিশ্বাস ও সংস্কার। *মফস্বলী বৃত্তান্ত* উপন্যাসে টুলটুলিকে একটি বনজ ওষুধ তুলে আনতে দেখি। ওরা বিশ্বাস করে এটি বেটে খাওয়ালে নাকি প্রসব বেদনা শুরু হয় এবং গর্ভকষ্ট দূর হয়।[২০] *তিস্তাপুরাণ*-এ যেমন পা মচকালে ভেরেণ্ডা পাতা থেঁতো করে বেঁধে তাতে গরম চুন-হলুদ লাগানোর প্রসঙ্গ আছে [২১] তেমনই ধানজ্বর বা ম্যালেরিয়া হলে মাথায় জল ঢালা ও নিম পাতার রস খাওয়ানোর প্রসঙ্গ আছে।[২২]

লোকক্রীড়া

লোকসংস্কৃতির অন্যতম জনপ্রিয় আঙ্গিক হল লোকক্রীড়া। লোকক্রীড়ায় বিভিন্ন আঞ্চলিক বৈশিষ্ট বর্তমান থাকে। অবসর সময়ে আনন্দ-বিনোদনের উপায় খেলা। *তিস্তাপুরাণ*-এ চককাউর বা পৈতন খেলার বর্ণনা আছে।

লোকশিল্প

লোকশিল্প এবং লোক প্রযুক্তির মধ্যে গভীর যোগ আছে। তবে সূক্ষ্ম পার্থক্য হল লোকশিল্পে নান্দনিকতা ও শৈল্পিক দিক যুক্ত হয়। উপন্যাস তিনটিতে ঝুড়ি, টুকড়ি, টোপা, মাথোয়াল, মাথালি, সোলোংগা ইত্যাদির যে ব্যবহার পাই তাতে লোকপ্রযুক্তি থাকলেও এর নান্দনিকতার দিকটিকে অস্বীকার করা যায় না।

লোকসংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল হাট-বাজার। শুধুমাত্র অর্থনীতির দিক থেকে নয়,হাটের সামাজিক ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের সকলের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ, কথাবার্তা এবং খোজখবরের ক্ষেত্রে হাট শ্রেষ্ঠ স্থান। দেবেশ রায়ের

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত এবং *তিস্তাপুরাণ* উপন্যাসে লেখক হাট সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। শুধুমাত্র পুরুষ নয় মহিলারাও হাটের প্রতি ভীষণভাবে আকৃষ্ট। হাট নারীকে মুক্তির স্বাদ দেয়। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী কৃষকদের জীবনের সঙ্গে হাট এভাবে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত যে হাট-সম্পর্কিত প্রবাদ তাদের জীবনের অঙ্গ হায় উঠেছে। তেমনই দুটি প্রবাদ হল--

ক) কয় হাটের ছোয়াই, বাপক ডাকে বেয়াই। (*তিস্তাপুরাণ*, পৃ. ২২৮)
খ) জাই গেল ক্ষেতবাড়ি, মধ্যে হইল পথ
জাই গেলেন গিরির বৌ, নিত্য যাছে হাটত। (,, পৃ. ২২৯)

দেবেশ রায় উপরিউক্ত দুটি উপন্যাসে বিভিন্ন হাটের বর্ণনা দিয়েছেন--নাটাগুড়ির হাট, চ্যাংমারির হাট, ওদলাবাড়ির হাট, ক্রান্তির হাট, ধূপগুড়ির হাট, চালসার হাট ইত্যাদি। তিনি লিখেছেন যে রাজবংশী কৃষকসমাজ বিশ্বাস করে 'যেইলা চ্যাংড়া হাটোখান চেনে না, উমরায় হাল ধরিবে কী?'(*তিস্তাপুরাণ*, পৃ. ২২৭)। অর্থাৎ হাটে যেতে যেতেই ছেলেরা বড়ো হয়ে ওঠে, নেশা ভাং শেখে, বিভিন্ন জায়গার মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে পরিপক্ক হয়ে ওঠে।

প্রকৃতপক্ষে কৃষিকেন্দ্রিক জীবনের সার্বিক রূপ ফুটিয়ে তুলতে গেলে তাদের সংস্কৃতিকে জানতেই হবে। বাংলার কৃষিজীবনে যে-সমস্ত আচার-সংস্কার, বিশ্বাস, ব্রত, উৎসব, ছড়া-প্রবাদ-ধাঁধা, নৃত্য-গীত প্রচলিত তা-ই নির্দিষ্ট উপন্যাসগুলি আলোচনার ভিত্তিতে আমরা দেখেছি জাদুতে, অলৌকিক ক্ষমতায়, দৈবী সত্তায় এবং অনুরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশ্বাসই হল কৃষিকেন্দ্রিক গ্রামবাংলার পূজা-পার্বণের মূল উৎস। এর ফলেই গড়ে উঠেছে মাতৃকা উপাসনা, উর্বরতা-তন্ত্র, যৌণ-প্রতীক উপাসনা ইত্যাদি। সন্তান এবং শস্য হয়ে উঠেছে সমার্থক। সন্তান এবং শস্য লাভকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পুজো, ব্রত, উৎসব সৃষ্টি হয়েছে। আবার মৌখিক সাহিত্য যেমন ছড়া-প্রবাদ-ধাঁধা, নাট্য-গীত ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তাদের প্রাত্যহিক জীবনের আশা-আকাঙক্ষা, সুখ-দুঃখ, প্রকৃতির পীড়ন থেকে মুক্তির চেষ্টা এবং আনন্দ-বিনোদনের চিত্রই ফুটে ওঠেনি, সঙ্গে সঙ্গে জীবন সম্পর্কে নিগূঢ় অভিজ্ঞতার প্রকাশও ঘটেছে। উপন্যাস তিনটিতে কৃষক সমাজের কৃষিকার্যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের নিদর্শন পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। কৃষকরা জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটায় ক্ষেতে-প্রান্তরে। সূতরাং তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড কোনো না কোনো দিক দিয়ে কৃষির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। দেবেশ রায় যে তাঁর এই তিনটি উপন্যাসে নিপুণ দক্ষতায় উত্তরবঙ্গের কৃষকদের জীবনের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন সে কথা অনস্বীকার্য।

.....

তথ্যসূত্র

১) গোপাল হালদার, সংস্কৃতির বিশ্বরূপ, পৃ. ১৯
২) দেবেশ রায়, *মফস্বলী বৃত্তান্ত*, পৃ. ৬৯
৩) তদেব, পৃ. ৪০
৪) দেবেশ রায়, *তিস্তাপুরাণ*, পৃ. ২৯
৫) তদেব, পৃ. ৬৫
৬) তদেব, পৃ. ৩৪০
৭) তদেব, পৃ. ৫৪৯
৮) দেবেশ রায়, *মফস্বলী বৃত্তান্ত*, পৃ. ৪৯
৯) দেবেশ রায়, *তিস্তাপুরাণ*, পৃ. ৫৫
১০) তদেব, পৃ. ৪০৪-৪১০
১১) দেবেশ রায়, *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*, পৃ.৬৩১ এবং ৭০৭
১২) দেবেশ রায়, *তিস্তাপুরাণ*, পৃ. ৬৮
১৩) তদেব, পৃ. ৪১৫-৪২১
১৪) মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা কৃষিবিজ্ঞান*, পৃ. ১
১৫) বরুণ কুমার চক্রবর্তী, *ধাঁধা : স্বরূপসন্ধান*, পৃ.৩
১৬) ড. শীলা বসাক, *বাংলা ধাঁধার বিষয়বৈচিত্র্য ও সামাজিক পরিচয়*, পৃ.৩
১৭) দেবেশ রায়, *তিস্তাপুরাণ*, পৃ.৭৮
১৮) ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা লোকসংগীত রত্নাকর*, পৃ. ২
১৯) দেবেশ রায়, *তিস্তাপুরাণ*, পৃ.৬৫০
২০) দেবেশ রায়, *মফস্বলী বৃত্তান্ত*, পৃ. ৬২
২১) দেবেশ রায়, *তিস্তাপুরাণ*, পৃ. ৩২
২২) তদেব, পৃ. ৫৩২